বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূলভিত্তি হচ্ছে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন। স্বাধীন বংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পেছনে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই তৎকালীন পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলন সুসংহত হয় এবং অগ্রগতি লাভ করে। ভাষা আন্দোলনের চেতনাই জনগণের মধ্যে পরবর্তীকালে একাত্তরের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের এক নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটায় এবং এর মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে।

বাঙালি জনগণের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আকাক্সক্ষাকে হাজারগুণে বাড়িয়ে দেয় এ আন্দোলন। তাই '৫২-এর ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির গণচেতনার সর্বপ্রথম বহিঃপ্রকাশ এবং স্বাধিকার আন্দোলনের এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

সুদীর্ঘ প্রায় দুইশ' বছর ব্রিটিশদের অপশাসন ও কুশাসনের অবসান ঘটার পর ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতীয় উপমহাদেশে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়।

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে ভারত গঠিত হলেও শুধু ধর্মীয় কারণে বাংলাদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

তবে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের আদর্শগত কোনো যোগসূত্র ছিল না বললেই চলে। মূল কারণ হিসেবে বলা যায়, উভয় অঞ্চলের মধ্যকার ভাষাগত বিরোধ।

ভাষাগত বিরোধের কারণে বাংলার জনগণ পাকিস্তানের Fundamental Ideology-র সঙ্গে কখনও একাত্মতা অনুভব করতে সক্ষম হয়নি।

এছাড়া পূর্ব বাংলার মানুষের প্রতি নানাভাবে বৈষম্যমূলক নীতি আরোপ করা হয় পাকিস্তানের পক্ষ থেকে।

মূলত এসব কারণেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই ভাষা আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে পূর্ব বাংলায় 'তমুদ্দুন মজলিস' নামে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।

তমুদ্দুন মজলিসের নেতৃত্বে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন তরুণ অধ্যাপক আবুল কাশেম। আর সেই ভাষা আন্দোলনের প্রভাব বাংলার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতিটা পরতে পরতে প্রত্যক্ষ করা যায়। যার সার্থক ফসল আজকের এ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট :

বাঙালির ভাষা আন্দোলনের পেছনে এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। নিখিল পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক পন্থায় পূর্ব বাংলায় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা চালানো হয়।

যার পরিপ্রেক্ষিতে ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক ও ছাত্রের উদ্যোগে 'তমুদ্দুন মজলিস' গঠনের মাধ্যমে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয় এবং সে আন্দোলনে চূড়ান্ত সফলতা আসে বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং ভাষা-সংস্কৃতি হারানোর উপক্রম হয়। পাকিস্তানি শাসকরা বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি চরম অবজ্ঞা পোষণ করে সেদিন বাঙালি জাতিকে নতুন করে যে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে, তার পরিণাম ছিল ভয়াবহ।

পাকিস্তানি নব্য উপনিবেশবাদী শাসকগোষ্ঠী শুরু থেকেই এদেশের নিরীহ মানুষের ওপর নির্যাতনের স্ট্রিম রোলার অব্যাহত রাখে। তাদের প্রথম ফন্দি ছিল কীভাবে বাংলার মানুষের মুখের ভাষাকে ছিনিয়ে নেয়া যায়।

এরই অংশ হিসেবে তারা বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং বাঙালির ঘাড়ে পাকিস্তানি Culture চাপিয়ে দেয়ার নীলনকশা অঙ্কন করে।

তৎকালীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এসে এক সমাবেশে ঘোষণা দেন; 'Urdu & Urdu shall be the state language of Pakistan'.

কিন্তু এদেশের ছাত্র-যুবকরা সে সমাবেশেই No, No, It can't be ধ্বনি তুলে তার এ ধৃষ্টতাপূর্ণ ঘোষণার বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানায়।

পাকিস্তানি সরকার সব প্রতিবাদকে পাশবিক শক্তি দ্বারা দমনের চেষ্টা চালায়। তাদের বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় এদেশের মানুষ।

বাংলার দামাল ছেলেরা শুধু নয়, সর্বস্তরের মানুষ মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য বজ্র কঠিন শপথ গ্রহণ করে। বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন।

এ আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ায় ছাত্র ও যুবসমাজসহ সর্বস্তরের বাঙালি জনগণ। পূর্ব বাংলায় তিনটি পর্যায়ে আন্দোলন পরিচালিত হয়।

প্রথম পর্যায় :

১৯৪৭ সালের নভেম্বরে করাচিতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একটি শিক্ষাবিষয়ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উর্দুকে গোটা পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ফলে পূর্ব পাকিস্তানের এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিক্ষোভ শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতে এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ঢাকায় সর্বপ্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয় এবং দাবি পূরণে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের নীতি গ্রহণ করা হয়।

সংগ্রাম পরিষদের দাবি ছিল-

১. বাংলা ভাষা হবে পূর্ব বাংলার একমাত্র শিক্ষার বাহন ও অফিস-আদালতের প্রধান মাধ্যম।

২. গোটা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা ও উর্দু। এ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই আন্দোলন পরিচালিত হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়:

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে কংগ্রেস দলীয় সদস্যরা বিশেষত কুমিল্লার একজন সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষা ব্যবহারের দাবি জানান।

কিন্তু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এ দাবির বিরোধিতা করেন। ফলে ঢাকায় ছাত্রসমাজ ও বুদ্ধিজীবী মহলে চরম অসন্তোষের বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়ে। তারপর ২৬ ফেব্রুয়ারি সর্বত্র ধর্মঘট পালিত হয়।

সংগ্রাম পরিষদ এভাবে ১৫ মার্চ পর্যন্ত ধর্মঘট ও হরতাল পালনের মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন অব্যাহত রাখে। একপর্যায়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন বাংলা ভাষার দাবি মেনে নেয়ার আশ্বাস দিলে আন্দোলন সাময়িক প্রশমিত হয়।

কিন্তু ১৯৪৮ সালের একুশে মার্চ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ রেসকোর্স ময়দানের একটি জনসভায় এবং কার্জন হলের এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে পুনরায় ঘোষণা দেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'

এ ঘোষণার পর আন্দোলন পুনরায় চাঙ্গা হয়ে ওঠে এবং দেশব্যাপী তীব্র প্রতিবাদের ঝড় প্রবাহিত হয়।

চূড়ান্ত পর্যায় :

ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে রূপ নেয় ১৯৫০ ও ১৯৫২ সালে। ১৯৫০ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান নতুন করে ঘোষণা দেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।'

এতে বাঙালি প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং আন্দোলন আরও জোরদার করার শপথ গ্রহণ করে। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন একই ঘোষণার পুনরাবৃত্তি ঘটান।

ফলে ছাত্রসমাজ, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীসহ সব শ্রেণীপেশার মানুষের মাঝে নিদারুণ ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি হয়। আন্দোলনের গতিবেগ ধীরে ধীরে তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে।

এ আন্দোলনের অংশ হিসেবে ৩০ জানুয়ারি ঢাকার রাজপথে সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত হয় এবং জনসভা করা হয়।

আন্দোলনকে আরও তীব্র ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ৩০ জানুয়ারির জনসভায় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করা হয়।

গঠিত কমিটির সভায় ২১ ফেব্রুয়ারিকে ভাষা দিবস হিসেবে পালন এবং দেশব্যাপী হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারির হরতাল কর্মসূচি বানচাল করার লক্ষ্যে তৎকালীন গভর্নর নুরুল আমীন সরকার ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে।

সরকারের এ অশুভ কর্মকাণ্ডের দাঁতভাঙা জবাব দেয়ার জন্য ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্ররা গোপন বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেয়, যে কোনো মূল্যে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হবে।

পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২১ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রতিবাদ সমাবেশের আহ্বান করা হয়।

সমাবেশ শেষে মিছিল বের হয়। সে দিন ছাত্রসমাজের প্রতিবাদী কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি।

ক্রমান্বয়ে উত্তাল হয়ে ওঠে ঢাকার রাজপথ। ওই সময় প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন চলছিল ঢাকায়। ভাষার দাবিতে সোচ্চার মিছিলটি জোর কদমে এগিয়ে চলে প্রাদেশিক ভবন অভিমুখে।

সে দিন ঢাকায় প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল।

মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করে। পুলিশের গুলির আঘাতে একে একে রাজপথে লুটিয়ে পড়ে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, সফিউর প্রমুখ যুবকরা।

বুকের ফিনকিঝরা তাজা রক্তে রঞ্জিত হয় ঢাকার পিচঢালা কালো পথ।

বাংলার মানুষের রক্তের বন্যায় ভেসে যাওয়া কালি দিয়ে লেখা হয় এক অনন্য ইতিহাস। অবশেষে তীব্র বিক্ষোভের মুখে পাকিস্তান সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

সাময়িকভাবে বাংলাকে অন্যতম জাতীয় ভাষা করার প্রস্তাব প্রাদেশিক পরিষদে উপস্থাপন করা হয়। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

তারপর সাংবিধানিকভাবে ১৯৫৬ সালে সংবিধানের ২১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয়।

মাতৃভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাঙালি জাতির চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়।

ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূলভিত্তি :

ভাষা আন্দোলন বাঙালির গণচেতনা ও স্বাধিকার আন্দোলনের এক বলিষ্ঠ ভূমিকা।

ভাষার জন্য আন্দোলন এবং জীবনদানের মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠিত করা পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত।

বিশ্বের আর কোনো দেশের মানুষের ভাষার জন্য সংগ্রাম ও রক্তদানের ইতিহাস নেই।

তাই ভাষা আন্দোলন বাংলার জনগণের মধ্যে নতুন জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটায় এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করে।

এ আন্দোলনই পর্যায়ক্রমে বাঙালি জাতিকে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ করেছিল।

ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিল, তা পরবর্তী আন্দোলনগুলোর জন্য আশীর্বাদ বয়ে আনে।

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয়, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা,

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের জন্য বিশেষভাবে প্রেরণা জুগিয়েছে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন।

সুতরাং ভাষা আন্দোলনই পরবর্তীকালে সব রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে স্বাধীনতার পথকে সুপ্রশস্ত করেছে, এটি অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

তাই এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে,

ভাষা আন্দোলনই বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূলভিত্তি ও চেতনা এবং একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের সফল অনুপ্রেরণা।